The Faculty Journal of Arts, University of Rajshahi
Volume 38, December 2024, ISSN 1813-0402

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ : সাধারণের অংশগ্রহণ
[The Oath-taking Ceremony of Mujibnagar Government: Participation of the mass]

Dr. Md. Arifur Rahman
Professor, Department of Islamic History & Culture, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
University of Rajshahi
Volume-38, December-2024
ISSN: 1813-0402 (Print)
DOI: 10.64487

Received : 24 July 2024
Received in revised: 2 March 2025
Accepted: 07 January 2025
Published: 10 August 2025

Keywords:
Mujibnagar Government, Liberation war, Grass root people, Independent Bangladesh.

ABSTRACT

The first Government of Bangladesh was formed on 10 April and sworn in on 17 April 1971 at Mujibnagar. The Government had also been known as Mujibnagar Government. The Liberation War of Bangladesh was led by this government. This government led a nine-month long armed conflict. Grass root people of this area supported wholeheartedly extorted their co-operation to the oath-taking ceremony. Grass root people participated in the armed war and dedicated their all things to that war. Mujibnagar Government coordinated the war efforts of the Mukti Bahini and the nescent Bangladesh Armed Forces. It operated as a government in-exile from Kolkata. Mujibnagar Government played a vital role in the liberation war of Bangladesh. As a result, Bangladesh became independent on December 16, 1971. In this paper I will try to explain how grass root people played a vital role to formation of Mujibnagar Government.

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরই সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ২৬শে মার্চ (২৫শে মার্চ দিবাগত রাত) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই সারাদেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধ যুদ্ধ। 'কুষ্টিয়া জেলার'[১] মানুষ সেই প্রতিরোধ যুদ্ধে শামিল হতে খুব বেশি সময় নেননি। ২৫শে মার্চ রাতেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কুষ্টিয়া শহর দখল করে নেয়। তবে কুষ্টিয়ার সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন, অংশগ্রহণ ও অসীম ত্যাগের কারণে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে (৩১শে মার্চ) কুষ্টিয়া শহর শত্রুমুক্ত করা সম্ভব হয়। স্বাধীনতা ঘোষণার (২৬শে মার্চ) পর বাংলাদেশে এটিই সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ জনযুদ্ধ[২] ছিল। কুষ্টিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়- "Kushtia is one of the few districts completely liberated from the Pakistani Army. The kushtia town was taken by the Mukti Bahini after a three pronged assault on the Army on March 29".[৩] ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই উদাত্ত আহ্বান-"তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে; ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো।" এই আহ্বান জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রেরণা যুগিয়েছিল।[৪] ৭ই মার্চের উদাত্ত আহ্বানের পর সমগ্র দেশের ন্যায় কুষ্টিয়া জেলাতেও যুদ্ধ প্রস্তুতির এক সাজ সাজ রব ওঠে। যেটির বহিঃপ্রকাশ ২৫শে মার্চের পরই লক্ষ করা যায়। এমতাবস্থায় স্বাধীনতা ঘোষণার যথার্থতা ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমদ ১০ই এপ্রিল (১৯৭১ সাল) স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে সরকার গঠন করেন।[৫] অতঃপর নবগঠিত সরকারের শপথ গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তাঞ্চল খোঁজা শুরু হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেন, কুষ্টিয়া জেলায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। উল্লেখ ৩১শে মার্চ থেকে ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত কুষ্টিয়া মুক্তাঞ্চল ছিল। যাহোক অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় প্রথম বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১৭ই এপ্রিল বৈদ্যনাথতলায় শপথ গ্রহণ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ

৪ঠা এপ্রিল (১৯৭১) ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দিনের সাক্ষাতের পর থেকে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যথা: ১. আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় হাইকমান্ড নিয়ে সরকার গঠন করা এবং ২. সরকারের শপথগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তাঞ্চল নির্ধারণ করা। এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর ১১ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণে

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দাবি করেন বাংলাদেশকে দখল মুক্ত করার জন্য সারাদেশে যে যুদ্ধ তৎপরতা চলছে তা এই সরকারের নিয়ন্ত্রণে।[৬]

ভারতে অবস্থানরত তাজউদ্দিন সীমান্ত এলাকায় এসে দেশের অভ্যন্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ-খবর নেন। সেই সঙ্গে সার্বিক দিক নির্দেশনা দিয়ে যান। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তিনি কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর এলাকার নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর এই এলাকাতে সরকারের শপথ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন। সে সময় তিনি প্রাথমিকভাবে শপথ অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য তারিখ ১৪ই এপ্রিল নির্ধারণ করেন।[৭] মেহেরপুরের তদানীন্তন মহকুমা প্রশাসক শপথগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন- "মেহেরপুরের কোন স্থানে বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের প্রস্তাবের কথা আমরা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের দিকে জানতে পারি। আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য গভীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।"[৮] তাজউদ্দিন আহমদের কথার সূত্র ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম কমান্ডের উপদেষ্টামণ্ডলী চুয়াডাঙ্গাতে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপনের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তখন চুয়াডাঙ্গা মুক্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে আবু ওসমান চৌধুরী বলেন:

> ১০ই এপ্রিল গঠিত স্বাধীন বাংলা মন্ত্রিপরিষদকে চুয়াডাঙ্গায় শপথগ্রহণ করানো হবে বলেও প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু ১৪ই এপ্রিল থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তনের ফলে শপথ গ্রহণের স্থান চুয়াডাঙ্গার পরিবর্তে মেহেরপুরের সীমান্ত এলাকা বৈদ্যনাথতলা মনোনীত করা হয়।[৯]

এমতাবস্থায় ১৪ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় শপথ গ্রহণের দিনক্ষণ অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু শপথ গ্রহণের তারিখটি গোপন রাখতে চাইলেও অসতর্কতাবশত তা সংবাদ মাধ্যমগুলো জেনে যায়। অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছেও সংবাদটি গোপন থাকেনি। ফলে যশোর থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আকাশপথে চুয়াডাঙ্গায় হামলা চালায়। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেন-

> মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক শপথের জন্যে ১৪ই এপ্রিল দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। শপথ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা চুয়াডাঙ্গার কথা প্রথমে চিন্তা করি। কিন্তু ১৩ই এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চুয়াডাঙ্গা দখল করে নেয়। পাকিস্তানি বাহিনী বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে। আমরা চুয়াডাঙ্গায় রাজধানী করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত তা আর গোপন থাকেনি। চুয়াডাঙ্গার কথা তখন বাদ দিয়ে আমরা নতুন স্থানের কথা চিন্তা করতে থাকি।[১০]

১৪ই এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ পেছানো প্রসঙ্গে ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের উপদেষ্টা ইউনুস আলী লিখেছেন:

> ১৪ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সারা বিশ্বের কাছে প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া হবে এবং সাহায্য ও স্বীকৃতির আহ্বান জানানো হবে। সেদিন স্বাধীন বাংলা বেতারে ভাষণ প্রচার করা হবে। প্রস্তুতিলগ্নে বিদেশি সাংবাদিকদের আসা যাওয়ার মধ্যে কোন অসতর্ক মূহুর্তে চুয়াডাঙ্গা বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে যায় এবং অস্থায়ী রাজধানী উল্লেখ করে বিদেশি বেতারে সংবাদ প্রচার করা হয়। ফলে গোপনীয়তা রক্ষা ও নিরাপত্তার কারণে অনুষ্ঠান ৩ দিন পিছিয়ে দিয়ে ১৭ই এপ্রিল স্থির হয়। তখন সেখানকার সমুদয় আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা উঠিয়ে ভবের পাড়ায় নেয়া হয়। ১৪ তারিখেই চুয়াডাঙ্গা থেকে অতি সন্তর্পণে সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয়।[১১]

১০ই এপ্রিলের পর কুষ্টিয়া অঞ্চলের যুদ্ধ নতুন দিকে মোড় নেয়। পাকিস্তানি বাহিনী সর্বশক্তি নিয়োগ করে কুষ্টিয়া জয়ের চেষ্টা শুরু করে। বার বার কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গার উপর বিমান হামলার ফলে সাধারণ মানুষ ও যোদ্ধাদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। পাকিস্তানিদের উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সদস্যরা পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের সময় ও সুযোগ পাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় চুয়াডাঙ্গা থেকে সদর দপ্তর সরানো ও শপথ গ্রহণের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।[১২] তখন চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ায় কন্ট্রোলরুমগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণকে বলা হচ্ছিল তারা যেন নিজ দায়িত্বে নিরাপত্তার সন্ধানে চলে যায়। তখন কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা শহর জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরও অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর পতন ঘটে। মুক্তিযোদ্ধাদের পতনের কারণ হিসেবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্য মেজর জেনারেল সুখবন্ত সিং তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। বিষয় তিনটি হলো:

ক. পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের ক্ষিপ্রতা ও প্রচণ্ডতা;
খ. মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধের পরিবর্তে সম্মুখ সমর কৌশল; এবং
গ. সামরিক অভিযানগুলোতে জুনিয়রদের নেতৃত্ব দান।

শত্রুপক্ষের সামরিক বাহিনীর দক্ষ সামরিক প্রশিক্ষণ, পর্যাপ্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছিল। পক্ষান্তরে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা, সীমিত প্রশিক্ষণ এবং ভারি অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় প্রাথমিক সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ইতিহাসবিদ ড. আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন 'বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন' গ্রন্থেও

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাদের ব্যাখ্যা ছিল- 'সবচেয়ে বড় কারণ হলো আক্রমণকারী ও আক্রান্তের মধ্যে শক্তি সামর্থ্যের দুস্তর ব্যবধান ছিল।'[১৩] এ সময় কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা সদরের কথা শুনে মেহেরপুরের জনসাধারণও ভারতে চলে যেতে থাকে। তখন মেহেরপুরের খাদ্য গুদামের চাল, ডাল, ময়দা, গম, চিনি ও লবণ প্রভৃতি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মেহেরপুরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও আত্মগোপনে চলে যান। তবে সাধারণ জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে পুনরায় যুদ্ধে লড়াই করবার শক্তি সঞ্চয়ের চিন্তা করেন। এ প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক টাইমস্-এর বিদেশি সংবাদদাতা সিডনি শনবার্গ তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন:

> মেহেরপুরে অধিকতর ভারি অস্ত্রে সজ্জিত বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে বাঙালি সৈন্যরা পিছু হঠেছে, অনেক ক্ষেত্রে লড়াই না করেই। তবে তারা তাদের অস্ত্র বিসর্জন দেননি। বেশিরভাগ যোদ্ধাই পূর্বপাকিস্তান ও ভারতের গ্রাম এলাকায় মিলিয়ে গেছেন। তিন দিন আগে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হয় পূর্বপাকিস্তানি শহর মেহেরপুর। সেখান থেকে প্রায় ছয় মাইলের মধ্যে অবস্থিত এই ভারতীয় সীমান্ত শহরে এখন অনেক বাঙালি সৈনিক ও অফিসার জমায়েত হচ্ছেন।[১৪]

১২ই এপ্রিল ভারতীয় দু'জন বিএসএফ কর্মকর্তা গোলক মজুমদার ও ৭৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্নেল এইচ.আর. চক্রবর্তী বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম কমিটিকে আম বাগানের কিছু জায়গা পরিষ্কার করে রাখতে বলেন।[১৫] তখন সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা সুনির্দিষ্ট কারণ না জেনেই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন। তাদের সঙ্গে ঐ গ্রামের মোমিন, আইয়ুব হোসেন, করম আলী ও স্থানীয় খ্রিস্টান মিশনের ফ্রান্সিসও এ অভিযানে অংশ নেন।[১৬] মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক ১২ই এপ্রিলের দিকে ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে থেকে ১৬ই বা ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর সীমান্তে বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের তথ্য পান।[১৭] তৌফিক এলাহী বলেন, তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে শপথ গ্রহণের স্থান নির্ধারণ করতে হয়েছিল। বিষয় তিনটি হলো:[১৮]

ক. শহর থেকে দূরত্ব বজায় রাখা;
খ. ভারতীয় এলাকা থেকে যাতে সহজে বিদেশি সাংবাদিকরা আসতে পারেন; এবং
গ. শত্রুর সম্ভাব্য বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ছদ্মাবরণের ব্যবস্থা করা।

এ সময় পাবনার জেলা প্রশাসক নূরুল কাদের ১৩ই এপ্রিল তারিখেই জানতে পারেন মুজিবনগরে শপথ গ্রহণের কথা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> ১৩ই এপ্রিল তারিখে মেহেরপুর কোর্ট ভবনে আহত যোদ্ধাদের এবং অংশগ্রহণকারীদের তত্ত্বাবধান করছিলাম। এ সময় তৌফিক এসে বললো স্যার দু'জন ভারতীয় আর্মি অফিসার জেনারেল কে. রুস্তমজী এবং গোলক মজুমদার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। তাদের সঙ্গে বৈঠকে সরকারের শপথ গ্রহণের তারিখ ও স্থান নিয়ে আলোচনা হলো। ভারতীয় কর্মকতারা বললেন শপথ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আসবেন। কাছাকাছি এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী অবস্থান করছে। সুতরাং যে কোন মূহুর্তে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটতে পারে। আমি তাদের বললাম আমরা এখানে প্রায় ১০ হাজার যোদ্ধা আছি। এই অনুষ্ঠান শুরু থেকে শেষ করতে সময় লাগবে বড় জোর ঘণ্টা দুই। আমাদের ১০ হাজার যোদ্ধা এ সময় কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[১৯]

১২ই এপ্রিল তারিখে ভারতীয় যে দু'জন কর্মকর্তা (গোলক মজুমদার ও এইচ.আর.চক্রবর্তী) এসেছিলেন তারা ১৫ তারিখে পুনরায় বৈদ্যনাথতলায় আসেন।[২০] তারা সংগ্রাম কমিটিকে জানান ১৭ই এপ্রিল এখানে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথগ্রহণ করবে। সে লক্ষ্যে মঞ্চ নির্মাণ থেকে শুরু করে সব রকমের প্রস্তুতি ১৬ তারিখের মধ্যে শেষ করার জন্য সংগ্রাম কমিটিকে আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি দোয়াজ উদ্দিন মাস্টার বলেন:

> আমরা ভাবতেই পারিনি ইতিহাসের বাক পরিবর্তনকারী এতবড় ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ঘটবে এবং আমরা এমন একটি বিশাল কাজে অংশ নেয়ার সুযোগ পাব। ১৬ তারিখ দুপুরের মধ্যে মঞ্চ সজ্জার আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি হৃদয়পুর ক্যাম্প থেকে এলো। বৈদ্যনাথতলা ইপিআর ক্যাম্পের চৌকি এনে মঞ্চ তৈরি হলো। সারারাত বিপুল উৎসাহ্ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হলো।[২১]

১৬ই এপ্রিল বিকেলে শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি দেখার জন্য বৈদ্যনাথতলায় আসেন এম.এ.জি. ওসমানী। তিনি সার্বিক খোঁজ-খবর নেন। ১৬ই এপ্রিল তারিখের শপথ অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরিসহ সার্বিক প্রস্তুতির অনুরূপ তথ্য স্থানীয় আনসার সদস্য লিয়াকত আলীর নিকট থেকে জানা যায়। ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্ক টালি ও পিটার হেস ভারতীয় বেতাই সীমান্ত হয়ে ১৫ই এপ্রিল মেহেরপুর আসেন। তাদের লেখনীতে সে সময়ের কিছু চিত্র অনুধাবন করা যায়। তখন সাধারণ মানুষ ভিটে মাটি ছেড়ে শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যান। যারা থেকে যায় তাদের নানাবিধ দুর্দশার চিত্রও লক্ষ করা যায়। তারা সে সময় বৈদ্যনাথতলা যান। তবে সেদিন পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য প্রস্তুতি সেখানে লক্ষ করা যায় না বলে তারা জানান।[২২]

ইতোমধ্যে ১৫ই এপ্রিল দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের সদর দপ্তর মেহেরপুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ১৭ই এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠান বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেন:

> শপথ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের হাজির করার ভার ছিল আমার ও আব্দুল মান্নানের উপর। ১৬ই এপ্রিল আমরা দু'জন কলকাতা প্রেস ক্লাবে যাই। এই প্রথম বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দু'জন প্রতিনিধি বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হই। ক্লাবের সেক্রেটারি উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। তাদের আমরা অনুরোধ করি আমাদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য। এরপর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বার্তা নিয়ে এসেছি বলে তাদেরকে জানাই। পরদিন সমবেত সাংবাদিকদের ভোরবেলা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করি। সেখান থেকে গাড়ি করে তাদের অন্যত্র নেয়ার কথা জানাই। আমরা তাদেরকে আরো বলি নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর একটি বার্তা আপনাদেরকে দেয়া হবে।[২৩]

১৭ই এপ্রিল সকাল বেলা থেকেই পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম থেকে সাধারণ লোকজন আসতে থাকে। হৃদয়পুর সীমান্ত পার হয়ে ভারত থেকে বিভিন্ন গাড়ি আসতে থাকে। একটি গাড়িতে মিষ্টি আনা হলো। বোঝাই যাচ্ছে শপথ গ্রহণের পর বিতরণের জন্য এই মিষ্টি। এরই মধ্যে একটি পিকআপ ভ্যানে করে বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তি নিয়ে আসা হয়।[২৪] কৃষ্ণনগরের পটুয়ারা এই মূর্তি বানিয়েছে। যদিও পরে মূর্তিটি কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। আগের দিন মঞ্চের সামনে যে সাধারণ তোরণ নির্মাণ করা হয়, সেই তোরণের উপর তুলা ও কাপড় দিয়ে Welcome লিখে দেন ভবের পাড়া মিশন হাসপাতালের নার্স মিস ক্যাথেরিনা ও মিস তেরেজিনা।[২৫]১৭ই এপ্রিল তারিখে বৈদ্যনাথতলার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সোলেমান বিশ্বাস সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন:

> বাগোয়ান থেকে রওনা হলাম বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে। সেখানে দেখি এস.ডি.ও. তৌফিক-ই-এলাহীসহ অনেকেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। আমাকে দেখেই তৌফিক-ই-এলাহী বললেন- চেয়ারম্যান সাহেব কলকাতা থেকে আমাদের নেতৃবৃন্দ আসছেন। কিছুক্ষণ পর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে, কিন্তু জাতীয় পতাকা নেই। আপনি পতাকার ব্যবস্থা করুন। তক্ষুণি মোটরসাইকেল নিয়ে আনন্দবাস হাইস্কুল ও আনন্দবাস ইপিআর ক্যাম্প থেকে দুটি পতাকা নিয়ে এসে তৌফিক-ই-এলাহী সাহেবের হাতে দিলাম। অনুষ্ঠানে যখন ঘোষণা করা হলো- স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করবেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমি তখন আনন্দিত হয়ে উঠলাম। আজ এই ক্ষণে আমারই সংগৃহীত পতাকা কিছুক্ষণের মধ্যে বাতাসে উড়বে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আস্তে আস্তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে লাগলেন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিবর্গ শপথগ্রহণ করলেন। জন্ম হলো স্বাধীন বাংলাদেশের।[২৬]

১৭ই এপ্রিল তারিখের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুর ঘটনা জানা যায় মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক এলাহীর নিকট থেকে। তিনি বলেন:

> সকাল ৯ টার দিকে আমি, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও অন্যদের সাথে নিয়ে সেখানে পৌঁছালাম। ওখানে আশে পাশের গ্রাম থেকে কিছু চেয়ার নিয়ে আসা হয়েছিল। মাহবুব ও আমি দ্রুত একটি অনুষ্ঠানসূচি প্রণয়ন করে ফেললাম, অন্যদের তা দেখালাম। সেখানে হাজার দুয়েক লোক জমায়েত হয়েছে। তার মধ্যে অন্তত শতাধিক সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার ও টিভি ক্যামেরাম্যান ছিল। নীরব আম্রকুঞ্জে সমবেত গ্রামের মানুষ নিকট অতীতে এমন কোন অনুষ্ঠান দেখেনি। আমরা অনুষ্ঠানের কথা গোপন রেখেছিলাম। তারা যেন অঘটন ঘটতে দেখছে– বিস্ময়াবিষ্ট, নিষ্পলক।[২৭]

১৭ই এপ্রিলের প্রস্তুতির অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তৎকালীন পাবনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নূরুল কাদেরের বর্ণনা থেকে। তিনি বলেন:

> ১৭ তারিখ সকালে সভাস্থল থেকে আড়াই তিন মাইল ব্যাস-এ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অর্ধ-বৃত্তাকারে নিরাপত্তাব্যূহ রচনা করা হয়। মেহেরপুরের ভবেরপাড়া মৌজার বৈদ্যনাথতলায় মঞ্চ তৈরি করা হয়। সকাল দশটার মধ্যে বহুসংখ্যক ভারতীয় ও বিদেশি সাংবাদিক সভাস্থলে এসে উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগরের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তা ও কলকাতার কয়েকজন বাংলাদেশ সমর্থক গণ্যমান্য ব্যক্তিও অনুষ্ঠানে যোগ দেন।[২৮]

স্বল্প প্রচার সত্ত্বেও প্রায় পাঁচ হাজার লোক মুক্তিযুদ্ধের নেতা-নায়কদের, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকে সমবেত হন। সকাল এগারোটার দিকে নেতৃবৃন্দ এলে উপস্থিত জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনি ও করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাই। বহুসংখ্যক লোক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে করমর্দন করার জন্য ছুটে যান এবং অনেকেই পা স্পর্শ করে তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ১৭ই এপ্রিলের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানা যায় স্থানীয় অধিবাসী ও সেদিনের জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণকারী শাহাবুদ্দীন আহমেদ সেন্টুর নিকট থেকে। তিনি বলেন:

> বাগানের মধ্যে পশ্চিম রাস্তার কাছে স্টেজ করা হয়েছিল। স্টেজের সামনের দিকে মোটা দড়ির বেষ্টনী করা হয়েছিল। বাগানের দক্ষিণ প্রান্তের রাস্তার উপর কলাগাছের গেট। বাগানের কাছে গাছে মাইক লাগানো আর বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের জন্য চেয়ার সাজানো ছিল। সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে ভারত সীমান্তের হৃদয়পুরের দিক থেকে ২/৩টি গাড়ি এলো। ছুটে গেলাম গাড়ির কাছে, নামলেন আমার অতি পরিচিত আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছসেবক বাহিনী প্রধান রাজ্জাক ভাই ও ছাত্র নেতা আ.স.ম. আব্দুর রব।[২৯]

সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় অধিবাসী হাফিজউদ্দিন আহমদ বলেন:

> বৈদ্যনাথতলা আম বাগান চমৎকার সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। প্রায় ১০০ জন বিদেশি সাংবাদিক ভিডিও ক্যামেরাসহএই অনুষ্ঠান কাভার করার জন্য উপস্থিত ছিল । সুসজ্জিত মঞ্চের ঠিক পাশেই প্রথম সারির তিনটি চেয়ারে পাশাপাশি বসলাম ক্যাপ্টেন এ.টি. সালাউদ্দিন, মেঘ সিংহ ও আমি (হাফিজ)। এই অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন মেহেরপুরের এস.ডি.ও তৌফিক এলাহী। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের বহু প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে এসে গেছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। মূল অনুষ্ঠান শুরু হলো সুসজ্জিত মঞ্চে, শপথগ্রহণ করলো বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা।[৩০]

মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পাওয়া যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ইতিহাস ভিত্তিক 'পূর্ব পশ্চিম' উপন্যাসে। এখানে উল্লেখ করা হয়:

> গাড়িগুলো শেষ পর্যন্ত এসে থামল একটি বিশাল আম বাগানের মধ্যে। এই গ্রামটির নাম বৈদ্যনাথতলা, মহকুমা মেহেরপুর ও জেলা কুষ্টিয়া। কিছু লোক সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে চেয়ার সাজাচ্ছে, অধিকাংশই হাতল ভাঙ্গা চেয়ার, কাছাকাছি গ্রামের বাড়িগুলো থেকে জোগাড় করে আনা। জায়গাটিকে ঘিরে রাইফেল ও এল.এম.জি হাতে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পঁচিশ-ত্রিশ জন সৈন্য। তাদের ঠিক মুক্তিবাহিনীর সদস্য বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত প্রাক্তন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের একটি বিদ্রোহী বাহিনী। আশেপাশের গ্রাম থেকে ধেয়ে এসেছে বিপুল জনতা। অস্ত্রধারী সেনাদের বৃত্ত ভেদ করে তারা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারছে না বলে অনেকেই আম গাছগুলোতে চড়তে শুরু করেছে। সেদিন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ সরকার।[৩১]

১৭ই এপ্রিল সকাল ১১ টার দিকে শুরু হলো শপথ অনুষ্ঠানের মূলপর্ব। এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী। স্বেচ্ছাসেবকরা মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন। সেই সঙ্গে উষ্ণ করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। তৌফিক এলাহী তখন বিদেশি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে ব্যস্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার দেয়ার কথা ছিল। কথামত ৮নং সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরীর এই দায়িত্ব পালনের কথা ছিল। কিন্তু তাঁর আসতে দেরি হওয়ায় তৌফিক এলাহী মাহবুব উদ্দিনকে বলেন, গার্ড অব অনার দিতে না পারলে এ অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই তিনি মাহবুব উদ্দিনকে গার্ড অব অনার দিতে অনুরোধ করেন। এ প্রসঙ্গে মাহবুব উদ্দিন বলেন:

> আমি তৌফিক এলাহীর কথামত আমার সঙ্গে থাকা সৈনিক আর স্থানীয় কয়েকজন আনসার সদস্যকে ডেকে নিই। তাদেরকে প্রথমে প্র্যাকটিস করিয়ে নিই। এরপর তাদেরকে একত্রিত করে ফল ইন করালাম, কয়েকবার এ্যাটেনশন, স্ট্যান্ড এ্যাট ইজ করালাম, বার কয়েক সোলজার আমর্স প্রেজেন্ট আমর্স করালাম। সবাইকে যুৎসইভাবে তৈরি করে ফল ইন অবস্থায় দাঁড় করিয়ে সালাম দেয়ার জন্য তৈরি হলাম। তারপর অস্থায়ী সরকারের নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উঠলেন এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন। নেতৃবৃন্দ মঞ্চে উঠতেই আমার পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো দুই সারি আনসার, পুলিশ ও ইপিআর সদস্যদের কমান্ড করলাম এ্যাটেনশন, পরবর্তী নির্দেশ সোল্ডার আমর্স তারপর উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে কমান্ড দিলাম প্রেজেন্ট আমর্স। সবাই রাইফেলগুলো বুকের ছয় ইঞ্চি সামনে আকাশের দিকে নল তুলে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে অনড় দাঁড়িয়ে রইল। আমার ডান হাত স্যালুটের ভঙ্গিতে উঠে এলো মাথার ডান পাশে। এ সময় জাতীয় সংগীত গেয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম উর্ধ্বমুখে পতাকা উত্তোলন করেন।[৩২]

অনুষ্ঠানের শুরুতে গার্ড অব অনার প্রসঙ্গে আবু ওসমান চৌধুরী বলেন:

> ১৭ই এপ্রিল পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী নবগঠিত সরকারকে সালাম দেবার কথা আমারই ছিল। কিন্তু মেহেরপুরে সবকিছু ঠিকঠাক না করে রওনা দেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। ওদিকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এবং অন্যরা বৈদ্যনাথতলায় সময়মত পৌঁছে যান। ভাগ্যবশত তৌফিক ও মাহবুবকে আমি ভোর ৭টায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দ্রুত গতিতে মাহবুব উপস্থিত কিছু সংখ্যক যুদ্ধক্লান্ত ইপিআর ও আনসার মুজাহিদের মিলিত সৈন্যদের একত্রিত করে সদ্য আগত অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে সালাম প্রদান করেন। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন হাফিজ, আমার স্ত্রী-কন্যা এবং সৈন্যদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হই।[৩৩]

অনুষ্ঠানের শুরুতে গার্ড অব অনার প্রসঙ্গে গার্ড প্রদানকারী হামিদুল হক বলেন- "অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা মাহবুব উদ্দিনের নেতৃত্বে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে গার্ড অব অনার প্রদান করি।"[৩৪]গার্ড অব অনার প্রদানকারী অপর আনসার সদস্য লিয়াকত আলী বলেন- "অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন মাহবুব সাহেবের নেতৃত্বে আমরা সালাম প্রদান করি। সেখানে শুধুমাত্র আমরা ক'জন স্থানীয় আনসার সদস্য ছিলাম। শপথ অনুষ্ঠান শেষে পুনরায় আবু ওসমান চৌধুরী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন।"[৩৫] সেদিনের গার্ড অব

অনার প্রদান অনুষ্ঠানের অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় অপর আনসার সদস্য সিরাজ উদ্দিনের নিকট থেকে।[৩৬] ১৭ই এপ্রিলের অনুষ্ঠানের স্মৃতিচারণ ও গার্ড অব অনার প্রসঙ্গে তৎকালীন পাবনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নূরুল কাদের বলেন:

> পতাকা উত্তোলন শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম পুনরায় মঞ্চে এসে সারিভুক্ত হন। ক্যাপ্টেন মাহবুবের নেতৃত্বে জনা বিশেক ইউনিফর্মধারী পুলিশ ও আনসার সদস্য নিয়ে গঠিত একটি ছোট বাহিনী রাষ্ট্রীয় অভিবাদন জানান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি গার্ড পরিদর্শন করেন।[৩৭]

তবে নূরুল কাদেরের এই ভাষ্য থেকে কারা গার্ড অব অনার প্রদান করেন বা তাদের সংখ্যা কতজন ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায়না। এ প্রসঙ্গে সুকুমার বিশ্বাস তার 'মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন- "সেখানে মন্ত্রিবর্গ উপস্থিত হলে ক্যাপ্টেন মাহবুব তাদের অভিবাদন জানান। পরে মন্ত্রিপরিষদ শপথগ্রহণ করলে আবু ওসমান চৌধুরী অস্থায়ী প্রেসিডেন্টকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন।"[৩৮] সেখানে এ.আর. আজম চৌধুরী, ক্যাপ্টেন হুদা, মোস্তাফিজুর রহমান ও লে. হাফিজ উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের গার্ড অব অনারে উপস্থিত সুবেদার তবারক উল্লাহ বলেন- সেদিন ইপিআর বাহিনীর সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করেন।[৩৯] সেদিনের গার্ড অব অনার প্রসঙ্গে দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়–

> শপথ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনী হিসেবে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন এবং জেনারেল ওসমানীর অধিনায়কত্বে তাঁরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন।[৪০]

যাহোক বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে এটা বোঝা যায় যে, প্রথমে মাহবুব উদ্দিন এবং শপথ গ্রহণের পর আবু ওসমান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। তাদের সঙ্গে ৩০ জন ইপিআর সদস্য এবং ১২ জন স্থানীয় আনসার সদস্যও যোগ দেন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারী তিনজন আনসার সদস্যের কাছে থেকেও অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে সালাম প্রদান করা হয়। তারপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মঞ্চের ডান দিকে স্থাপিত স্তম্ভে পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় স্থানীয় কিছু ছাত্র-যুবক জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। জাতীয় সংগীত পরিবেশনকারী শাহাবুদ্দীন আহমেদ সেন্টু সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে বলেন:

> সেদিন বৈদ্যনাথতলায় রাজ্জাক ভাই (মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক) আমাকে কাছে ডেকে বললেন, অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাইতে হবে, ব্যবস্থার কর। তাঁর নির্দেশনায় স্থানীয় তরুণদের মধ্যে কে কে গান গাইতে পারে খোঁজ করতে ভবের পাড়ার পিন্টু বিশ্বাস, রামনগরের মনসুর উদ্দিন ও দরিয়াপুরের আসাদুল হক এগিয়ে এলেন। আমরা ছোটাছুটি করে হারমোনিয়াম ও তবলা সংগ্রহ করি। তারপর গাছ তলায় বসে রিহার্সেল শুরু করে দেই। সেখানে আ.স.ম. আব্দুর রব উপস্থিত ছিলেন। আমরা ৫ জন মিলে ১৫/২০ মিনিট রিহার্সেল করি। সে সময় বিদেশি সাংবাদিকগণ আমাদের ছবি তুলে নাম লিখে নিলেন। তারপর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জাতীয় পতাকা তোলা শুরু করলে আমরা জাতীয় সংগীত গাওয়া শুরু করি।[৪১]

জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় সংগীতে কারা কারা অংশ নিয়েছিল শাহাবুদ্দীন সেন্টুর অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায় উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলওয়াতকারী বাকের আলীর নিকট থেকে।[৪২] এরপর অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে বেলা ১১টা নাগাদ মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান মাইক্রোফোনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের নাম ঘোষণা করেন।[৪৩] মঞ্চে উঠে আসন গ্রহণ করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ক্যাপ্টেন এম.এ.জি. ওসমানী। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শপথ অনুষ্ঠানের। প্রথমে কুরআন তেলওয়াত করেন গৌরিনগরের বাকের আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলওয়াতকারী বাকের আলী সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন:

> ১৭ তারিখ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বৈদ্যনাথতলার দিকে রওনা হই। কাদেরগঞ্জ বাজার থেকে আম বাগান পর্যন্ত অপরিচিত লোকজন ও অস্ত্রধারী মানুষের আনাগোনা দেখতে পাই। আমি মঞ্চের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছিলাম। এমন সময় দোয়াজ উদ্দিন স্যার (বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি) আমাকে ডেকে বললেন, আজকের অনুষ্ঠানে তোমাকে কুরআন তেলওয়াত করতে হবে। প্রথমে আমি একটু ইতস্তবোধ করলেও পরে স্যারের কথায় রাজি হয়ে যায়। এরপর স্যার আমাকে ও আইয়ুব হোসেনকে নিয়ে ইপিআর ক্যাম্পে যান। সেখানে দেখি জাতীয় নেতারা বসে আছেন। তখন কামারুজ্জামান সাহেব আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং আমাকে কুরআন তেলওয়াত করতে হবে সে কথা জানালেন। তখন আমার ভয়টা আরো ঘনীভূত হচ্ছিল। তারপর অনুষ্ঠান শুরু হলে মাইকে ঘোষণা হলো, এবার কুরআন তেলওয়াত করবেন মাওলানা বাকের আলী। আসলে আমিতো মাওলানা ছিলাম না। আমি তখন ছাত্র ছিলাম। যাহোক আমি সেখানে সুরা ফাতিহা পাঠ করলাম। তখন সাংবাদিকদের শত শত ক্যামেরার আলোকচ্ছটা আমার চোখে এসে পড়ছিল।[৪৪]

উক্ত অনুষ্ঠানে বাকের আলী যে কুরআন তেলওয়াত করেন তা দোয়াজ উদ্দিন মাস্টার ও মোমিন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার থেকেও জানা যায়।[৪৫] কুরআন তেলওয়াতের পর বাইবেল, গীতা ও ত্রিপিটক পাঠ করা হয়।[৪৬] সেদিন বাইবেল পাঠ করেন ভবের পাড়া খ্রিস্টান মিশনের ফাদার ফ্রান্সিস।[৪৭] তবে গীতা ও ত্রিপিটক কারা পাঠ করেছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়

না। অতঃপর আওয়ামী লীগের নির্বাচিত চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।[৪৮] মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের পরিচিতি শেষে নেতৃবৃন্দ সারিবদ্ধভাবে মঞ্চে দাঁড়ান। এরপর অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ বাক্য পাঠ করান।[৪৯] অতঃপর অধ্যাপক ইউসুফ আলী বাংলাদেশের মুক্ত মাটিতে স্বাধীনতাকামী কয়েক হাজার জনতা এবং শতাধিক সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনান।[৫০] আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ব্যতীত এমনভাবে গণমানুষের সামনে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র উপস্থাপন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এরপর উক্ত ঘোষণাপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অধ্যাপক ইউসুফ আলী রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শপথবাক্য পাঠ করান।[৫১] উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিনের নাম ঘোষণা করেন। এরপর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসেবে কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী এবং সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ হিসেবে কর্নেল আব্দুর রবের নাম ঘোষণা করেন।[৫২] অত্যন্ত আনন্দঘন ও নিরাপদ পরিবেশে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হয়।

শপথপর্ব শেষ হবার পর শুরু হয় বক্তৃতাপর্ব। প্রথমে নবগঠিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ জাতির উদ্দেশে প্রায় ৩০ মিনিটব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। '৭০ এর নির্বাচনে বিজয়ী হবার পরও পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তরে কিভাবে গড়িমসি করছিল এবং মার্চ মাস থেকে গণহত্যার সার্বিক দিক তুলে ধরেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের একটি বিবৃতি[৫৩] দেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শেষ হলে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

> আজ এই মুজিবনগরে একটি নতুন স্বাধীন জাতি জন্ম নিল। বিগত ২৪ বছর যাবৎ বাংলার মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ঐতিহ্য ও নিজস্ব নেতাদের নিয়ে এগুতে চেয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি কায়েমী স্বার্থবাদীরা কখনই তা হতে দেয়নি। তারা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে এগুতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও তারা বাধার সৃষ্টি করে। আমাদের উপর চালালো ৰবর আক্রমণ। তাই আমরা আজ মরণপণ যুদ্ধে নেমেছি। এ যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য। আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করবোই। আজ না জিতি, কাল জিতবো; কাল না জিতি পরশু জিতবোই।[৫৪]

বক্তৃতা পর্ব শেষের মধ্য দিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী শপথ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা মঞ্চ থেকে নেমে আসে। এ সময় আবু ওসমান চৌধুরী ইপিআর বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন।[৫৫] এরপর সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে হয়। সেখানে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নবগঠিত বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেন। একই সময়ে প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী সাংবাদিকদের বলেন:

> দরকার হলে বিশ বছর ধরে লড়াই করবো। হতে পারে এ যুগের ছেলেরা লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু পরের যুগের ছেলেরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে। বাংলাদেশ যদি রক্ষা না পায়, তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমস্ত মানবিকতা নষ্ট হয়ে যাবে।[৫৬]

প্রধানমন্ত্রী যখন গাড়িতে উঠছিলেন তখন হঠাৎ করে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, আজ থেকে এই ঐতিহাসিক জায়গাটি কি নামে পরিচিত হবে? তখন তিনি ঘোষণা করেন, আজ থেকে এই জায়গাটি মুজিবনগর নামে পরিচিত হবে।[৫৭]

উপসংহার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব ও ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ১৭ই এপ্রিল থেকে বৈদ্যনাথতলা মুজিবনগর নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের দিন স্থানীয় সাধারণ মানুষ সার্বিকভাবে সহায়তা করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দিকনির্দেশনায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে শপথ অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকার কলকাতার মুক্তাঞ্চল থেকে পরিচালিত হয়। তাই একে প্রবাসী সরকারও বলা হয়। সমকালীন বিশ্বে যতগুলি স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে যেমন: আলজেরিয়া, মিয়ানমার, ফ্রান্স, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রবাসী সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।[৫৮] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রেও মুজিবনগর সরকার বা প্রবাসী সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘ নয় মাস এই সরকারের নামেই চলে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সরকারের সমস্ত কার্যক্রম। অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে মুজিবনগরের নাম আর পরিবর্তন হয়নি। বরং সমগ্র বাংলাদেশের অন্য নাম হয়ে গেছে মুজিবনগর।[৫৯]

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর মহকুমা নিয়ে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলা ছিল। বৈদ্যনাথতলা (বর্তমান মুজিবনগর) গ্রামটি ভারতের সীমান্তবর্তী মেহেরপুর মহকুমার অংশ ছিল। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মহকুমা তিনটি পৃথক জেলায় রূপান্তরিত হয়।

২ যখন কোন যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দেশের বা অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন, অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধ জয়ের লক্ষ্যে অসীম ত্যাগ স্বীকারে কোন কার্পণ্য থাকেনা, তখন সেটিকে জনযুদ্ধ বলা হয়। ১৯৭১ সালের জনযুদ্ধে বাংলাদেশের ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, সামরিক অফিসার, পুলিশ বাহিনী ও বেসামরিক আমলা এক কথায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এক লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলেয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সত্যিকার অর্থে জনযুদ্ধ ছিল। উৎস: এইচ. টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭১ (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪) পৃ.৩০।

[৩] সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯), পৃ.১৬৫।
[৪] এইচ.টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ২৯।
[৫] মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৮) পৃ. ১০৩।
[৬] রফিকুর রশীদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১৬।
[৭] *ঐ*, পৃ. ১৩৭।
[৮] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, ১৫ খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৩৬৫ (এরপর দলিলপত্র লেখা হবে)।
[৯] আবু ওসমান চৌধুরী, 'মুজিবনগর দিবস', রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ মুজিবনগর* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ২০০০), পৃ. ৫২।
[১০] *দলিলপত্র*, ১৫ খণ্ড,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৮।
[১১] ইউনুস আলী, 'প্রথম অস্থায়ী রাজধানীর প্রস্তুতি', রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *স্বাধীনতা যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা, দলিলপত্র* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৮), পৃ. ৯।
[১২] তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, 'চুয়াডাঙ্গার সশস্ত্র প্রতিরোধ', রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *স্বাধীনতা যুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা, দলিলপত্র* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৮), পৃ. ১৬।
[১৩] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮৬) পৃ. ৪২৪।
[১৪] সিডনি শনবার্গ , মফিদুল হক (অনুদিত), *ডেটলাইন বাংলাদেশ: নাইন্টিন সেভেনটিওয়ান* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫), পৃ. ৪৩।
[১৫] সাক্ষাৎকার : দোয়াজ উদ্দিন মাস্টার, সভাপতি, বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম কমিটি (১৯৭১), মুজিবনগর, সাক্ষাতের তারিখ: ০২.০৪.২০১৪।
[১৬] রফিকুর রশীদ, 'মহাকাব্যের প্রথমপাতা,' রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ২০০০), পৃ. ৪৭।
[১৭] *দলিলপত্র*, ৯ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৫।
[১৮] *ঐ*।
[১৯] মোহাম্মদ নূরুল কাদের, *একাত্তর আমার* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ৪৫-৪৬।
[২০] রফিকুর রশীদ, *মহাকাব্যের প্রথম পাতা,পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৭।
[২১] রফিকুর রশীদ, 'মুজিবনগর দিবস ও একটি উপেক্ষিত বিষয়', মেহেরপুর জেলা প্রশাসক (সম্পা.), *বৈদ্যনাথতলা থেকে মুজিবনগর* (মেহেরপুর: জেলা প্রশাসক), পৃ. ৫৫।
[২২] রফিকুর রশীদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর,পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪০।
[২৩] *দলিলপত্র*, ১৫ খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০।
[২৪] রফিকুর রশীদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৩।
[২৫] রাজিব আহমেদ, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর: দলিল ও ইতিহাস* (ঢাকা: বইপত্র, ২০১৩), পৃ. ১৫৮।
[২৬] সোলেমান বিশ্বাস, 'সেই দিনের স্মৃতি', রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ২০০০) পৃ. ৭৩।
[২৭] *দলিলপত্র*, ৯ম খণ্ড, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬৬।
[২৮] নূরুল কাদের, 'প্রথম মন্ত্রিপরিষদের শপথ', রাজিব আহমেদ (সম্পা), *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ,২০০০), পৃ. ৫১।
[২৯] শাহবউদ্দিন আহমেদ সেন্টু, 'দীপ্যমান স্মৃতি', রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ৭৪।
[৩০] হাফিজউদ্দিন আহমদ, 'বৈদত্যনাথতলায় মুজিবনগর সরকার', রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ২০০০) পৃ.৫৭।
[৩১] সাহান আরা বানু, 'মুজিবনগর ও আমাদের সাহসী স্বপ্নগুলো', মেহেরপুর জেলা প্রশাসক (সম্পা.), *বৈদ্যনাথতলা থেকে মুজিবনগর* (মেহেরপুর: জেলা প্রশাসক), পৃ. ৩৩।
[৩২] সাক্ষাতকার : ক্যাপ্টেন মাহবুব উদ্দিন আহমদ (বীরপ্রতীক), মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, ঢাকা, সাক্ষাতের তারিখ: ২৩.০৩.২০১৪ ও ২৭.০৩.২০১৪।
[৩৩] সাক্ষাতকার : আবু ওসমান চৌধুরী, ৮ নং সেক্টর কমান্ডার (১৯৭১), ঢাকা, সাক্ষাতের তারিখ: ২৭.০৩.২০১৪।
[৩৪] সাক্ষাতকার : হামিদুল হক (আনসার সদস্য), মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী, মুজিবনগর, সাক্ষাতের তারিখ: ০৩.০৪.২০১৪।
[৩৫] সাক্ষাতকার : লিয়াকত আলী (আনসার সদস্য), মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী, মুজিবনগর, সাক্ষাতের তারিখ: ০৩.০৪.২০১৪।
[৩৬] সাক্ষাতকার : সিরাজউদ্দিন (আনসার সদস্য), মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী, মুজিবনগর, সাক্ষাতের তারিখ: ০৩.০৪.২০১৪।
[৩৭] নূরুল কাদের, প্রথম মন্ত্রী পরিষদের শপথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।
[৩৮] সুকুমার বিশ্বাস, ,*পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭৩।
[৩৯] *ঐ*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।
[৪০] *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২১ ডিসেম্বর , ১৯৭১।
[৪১] শাহাবউদ্দিন আহমেদ সেন্টু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪।
[৪২] সাক্ষাতকার : বাকের আলী, মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণকালীন কুরআন তেলওয়াতকারী, মুজিবনগর, সাক্ষাতের তারিখ: ০২.০৪.২০১৪।

[৪৩] রফিকুর রশীদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর,পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪২।

[৪৪] সাক্ষাতকার : বাকের আলী, *পূর্বোক্ত*।

[৪৫] সাক্ষাতকার: মোমিন চৌধুরী, সদস্য, বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম কমিটি (১৯৭১), মুজিবনগর, সাক্ষাতের তারিখ: ০২.০৪.২০১৪; দোয়াজ উদ্দিন মাষ্টার, *পূর্বোক্ত*।

[৪৬] মাহবুবউদ্দিন আহমদ, '১৯৭১ এর ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে', রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ২০০০), পৃ.৫৫।

[৪৭] সাক্ষাতকার : মোমিন চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*।

[৪৮] সাক্ষাতকার: আইয়ুব হোসেন, সদস্য, বৈদ্যনাথতলা সংগ্রাম কমিটি (১৯৭১), মুজিবনগর, সাক্ষাতের তারিখ: ০৩.০৪.২০১৪; সাক্ষাতকার: বাকের আলী, *পূর্বোক্ত*।

[৪৯] Salahuddin Ahmed, *Bangladesh Past and Present* (Dhaka: Paragon Publishers, 2004), p. 201.

[৫০] রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *৭১' এর দশমাস* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭),পৃ. ১৬২।

[৫১] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.),*বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৮মখণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ২১৯।

[৫২] Salahuddin Ahmed, *op.cit.*,p. 202.

[৫৩] *Banglsdesh Documents*, Ministry of External Affair, New Delhi, 1971,pp. 291-298.

[৫৪] সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী,পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

[৫৫] আবু ওসমান চৌধুরী 'মুজিবনগর দিবস', রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ২০০০) পৃ.৫২-৫৩।

[৫৬] রফিকুর রশীদ, *মহাকাব্যের প্রথম পাতা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৮।

[৫৭] ডা. আসহাবুল হক, 'স্মৃতিতে সমুজ্জল', রাজিব আহমেদ (সম্পা.), *চুয়াডাঙ্গায় মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ বিবরণ* (চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৯) পৃ. ৩।

[৫৮] হোসেন তওফিক ইমাম, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর', এ.এফ.এম. সালাউদ্দীন আহমদ (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২৮৭।

[৫৯] রফিকুর রশীদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর,পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৯।